ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিটিসিএল: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
দিপু রায়

৩০ এপ্রিল ২০১৪

ভূমিকা

সরকারি টেলিযোগাযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)' প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পূর্বে বিটিসিএল বিটিটিবি নামে সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হলেও টেলিযোগাযোগ খাতকে বেসরকারি পর্যায়ে বিস্তার করার ফলে প্রতিযোগীতায় টিকতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বিটিটিবিকে মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ১ জুলাই ২০০৮ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি 'বাংলাদেশ টেলিকমুনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)' করা হয়। গত ২৩ মার্চ, ২০১০ তারিখে "সরকারি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুশাসনের সমস্যা এবং উত্তরণের উপায়" শিরোনামে প্রকাশিত টিআইবির গবেষণায় বিটিসিএলের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র উঠে আসে এবং টিআইবি বিটিসিএলের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কিছু সুপারিশ প্রদান করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো সুপারিশ বাস্তবায়নের তথ্য পাওয়া যায়নি। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল যাত্রার প্রায় ৬ বছর পার হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে কোম্পানিটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারছেনা। বিটিসিএল একটি কোম্পানি হিসেবে কেন কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিতকরণের জন্য টিআইবি পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় বিটিসিএলের বর্তমান অবস্থার উপরে এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিটিসিএলের কার্যকর পরিচালনায় সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে বিটিসিএলের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও বিরাজমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরণসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণাটি একটি গুণবাচক গবেষণা। এতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে বিটিসিএল, সিএজি ও দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিটিসিএলের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসহ অন্যান্য মুখ্য তথ্যদাতা। পরোক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ। এপ্রিল ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত এই গবেষণার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিবেদনে প্রকাশিত সকল তথ্য হাল-নাগাদকৃত।

বিরাজমান চ্যালেঞ্জ

সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন, পরিচালনা বোর্ডের সঠিক কাঠামো নির্ধারণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার, আইনী কাঠামো নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের নীতিমালা নির্ধারণ, শেয়ার উন্মুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন হলেও বিটিসিএলের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে বিটিসিএল একটি কার্যকর কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিটিসিএল কোম্পানির মত কার্যক্রম পরিচালনা করতে আরো অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

পরিচালনা বোর্ডের চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএলের পরিচালনার জন্য টেলিযোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হলেও বোর্ডে মাত্র দুই জন টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। বাকিদের ৬ জনই সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের টেলিকম বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সরকারি কর্মকর্তার আধিক্য থাকায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতামতই প্রাধান্য পায়। আবার পরিচালকদের বোর্ডে থাকার সুনির্দিষ্ট সময় না থাকায় তারা মন্ত্রণালয় বা এফবিসিসিআই ও আইসিএবির চেয়ারম্যানের পদ থেকে চলে গেলে বিটিসিএলের বোর্ড থেকেও চলে যান। ফলে অনেকক্ষেত্রে এই পদে তারা খুব অল্প সময় থাকায় তাদের মধ্যে কোম্পানির প্রতি কোনো মালিকানাবোধ তৈরি হয় না। এছাড়া বোর্ড কোনো সিদ্ধান্ত নিলেও বাস্তবায়নের সময় আবার সরকারি নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্টাফদের যে পারফরমেন্স বোনাস দেওয়া হয়েছিল তা সিএজির অডিট আপত্তি দেওয়ার কারণে ফেরত দিতে হচ্ছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগে জটিলতা

বিটিসিএলে এখনও কোম্পানির অর্গানোগ্রাম কার্যকর না হওয়ায় ২০০৯ সালে প্রজ্ঞাপণ অনুসারে চেয়ারম্যানকে আইনগতভাবে এমডি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করার নিয়মটি কার্যকর করা যাচ্ছে না। বিটিটিবি থাকাকালীন সময়ে চেয়াম্যান ছিলেন একজন ক্যাডারভুক্ত

কর্মকর্তা এবং তার গ্রেড ছিল ২। ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিষয়গুলো মীমাংসা না করে তাকে বিটিসিএলে এমডি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। বিটিসিএলের কর্মকর্তাগণ টেলিকম ক্যাডারের বাইরে কোনো ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগের বিরোধিতা করায় দুই বার বিজ্ঞপ্তি দিলেও এখন পর্যন্ত কোনো নিয়মিত এমডি নিয়োগ হয়নি। যেসব ভারপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এমডি নিয়োগ হচ্ছেন তারা এই পদে খুব অল্প সময় থাকেন এবং এমডির দায়িত্ব পালন করলেও কোম্পানির উন্নয়ন ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারেন না।

নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর করার চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএল ঘোষণার পরে মার্কেটিং, সেলস, কাস্টমার কেয়ার, আইটি ও বিলিং, কর্পোরেট সার্ভিস, বিজনেস রিলেসন, সিকিউরিটি ও লিগাল, এইচআরসহ নতুন নতুন বিভাগ সংযোজন করে একটি নতুন অর্গানোগ্রাম বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। এই অর্গানোগ্রাম অনুসারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোম্পানিতে যোগ দিতে হলে তাদের মধ্যে চাকরির সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এসব অনিশ্চয়তার কারণে কোম্পানির হয়ে কাজ করা বা না করার প্রশ্নে তাদের সামনে অপশন তুলে ধরা হলেও কর্মকর্তাগণ কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছে না। এ অবস্থায় ক্যাডার কর্মকর্তাগণ তাদের সরকারি চাকরি বজায় রাখার জন্য আদালতে মামলা করলে আদালত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ এর মধ্যে তাদেরকে আত্তীকরণ করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় আপিল করলে ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত রায় স্থগিত করা হয়। আদালতের রায় অনুযায়ী টেলিকম ক্যাডারের কর্মকর্তাদের আত্মীকরণের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় 'ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম্যুনিকেশন' (ডট) গঠন করার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ডট গঠনের জন্য জনপ্রশাসন, অর্থ এবং আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের মাধ্যমে সংসদ থেকে পাশ হতে হবে যা সময় সাপেক্ষ বিষয়। বর্তমানে এই ডট গঠনের প্রক্রিয়াটি আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও বাজেট শাখা থেকে অনুমোদনের পরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। অন্যদিকে ডট গঠন হলেও কর্মকর্তাদের আত্তীকরণের জন্য লিয়েন ও প্রেষণের বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নিয়মে কিছু জটিলতা রয়েছে। বিটিসিএলে পদায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন নতুন আইনে এই জটিলতা থেকে গেলে কর্মকর্তাগণ বিটিসিএলে কাজ করতে আগ্রহবোধ করবে না। আর 'ডট' গঠন ও নতুন আইন তৈরি করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নের বিষয়গুলো যতদিন না সমাধান হচ্ছে ততদিন নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কোম্পানির মতো করেও কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না।

জনবল সম্পর্কিত সমস্যা

বিটিসিএলের কাঙ্খিত লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব। কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেলস, মার্কেটিং, প্রচারণাসহ নতুন প্রযুক্তি যেমন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও এডিসিএল সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ লোক নাই। আবার জেলা, উপজেলা, গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত 'ইউনিভার্সাল সার্ভিস' অবলিগেশনের আওতায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নেই। বিশেষ করে সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ডিপ্লোমা) পদে কাজ করার মত প্রকৌশলীর অভাব প্রকট। বিটিটিবির সময়ে মঞ্জুরীকৃত পদ ছিল মোট ১৯,০৬৬টি কিন্তু বর্তমানে কর্মরত জনবল রয়েছে ৭৮০৮(৪১%) জন যা বিটিসিএলের নতুন অর্গানোগ্রামের পদের (৮৭০৩) তুলনায় কম। অন্যদিকে বিটিসিএলে পুরানো কিছু সেবা যেমন টেলিপ্রিন্টার, কল অপারেটর, টেকনিশিয়ান ও টেলিকম মেকানিক পদগুলো বন্ধ হলেও এই পদে লোক কর্মরত রয়েছে। ক্যাজুয়াল শ্রমিকদেরও অনেকেই আধুনিক প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলেও তারা চাকরি স্থায়ী করার জন্য বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে।

আকর্ষণীয় বিপণন কৌশলের অভাব

কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকে প্রতিযোগীতায় টিকতে হলে এর পণ্যের প্রসার ঘটাতে আকর্ষণীয় প্রচারণা প্রয়োজন। কিন্তু বাজেট স্বল্পতার কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছে না। বিটিসিএলের সেবার প্রচারণার জন্য কিছু বিজ্ঞাপন, লিফলেট ও ফেস্টুন তৈরি করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। ২০১০ সালে বিটিসিএলের ৫৯ সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপন বিভিন্ন চ্যানেলে মাত্র ৩ মাসের জন্য প্রচারিত হয় যার মাধ্যমে মাত্র একটি সেবার চিত্র উঠে আসে। আবার কোম্পানি হিসেবে পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হওয়ার কথা থাকলেও এই প্রচারণার জন্য সিএজি অফিসের আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে। একজন কর্মকর্তার এ ধরনের আপত্তি মীমাংশা করাতে আড়াই বছর সময় লাগে। এই আপত্তির কারণে প্রচারণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রচারণার কাজে আগ্রহ হারাচ্ছে।

নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিটিসিএলকে দুর্বল করা

১৯৯৮ সালে টেলিযোগাযোগ নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে ২০০৭ সালের 'ইন্টারন্যাশনাল লং ডিসটেন্স টেলিকমিউনিকেশন্স সার্ভিসেস' পলিসি (আইএলডিটিএস)'র মাধ্যমে তিনটি কোম্পানিকে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ের (আইজিডব্লিউ) লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং তারা বিটিআরসিকে টেরিফের ৫১.৭৫% দিতে রাজি হয়। বিটিআরসি এই তিনটি কোম্পানির সাথে সাথে আইজিডব্লিউর লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকেও এই টেরিফ ধার্য করে। পূর্বে বিটিটিবিকে এ ধরনের কোনো টেরিফ দিতে হত না এবং আন্তর্জাতিক কলের পুরো অংশই বিটিটিবি আয় করত। আবার বাংলাদেশের কল ভলিউমের উপর নির্ভর করে বিটিআরসি আর মাত্র ৪টি কোম্পানিকে আইজিডব্লিউর লাইসেন্স প্রদান করার সুপারিশ করলেও মন্ত্রণালয় তা অমান্য করে কিছু অসাধু রাজনৈতিক নেতাদের স্বাথে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে আরো ২৫টি কোম্পানিকে এই লাইসেন্স প্রদান করে যার মধ্যে কমপক্ষে ১০টির মালিক বর্তমান সরকার বা পূর্বের সরকারের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর আত্মীয়। এসব কোম্পানির বিটিআরসি, আসিএক্স ও এএনএসগুলোকে টেরিফের মোট ২.৬০২৫ সেন্ট প্রদান করতে হয়। বাকি অংশ থেকে সরঞ্জামাদি, জনবলের বেতন, বিপণন ইত্যাদির ব্যয় বাদ দিয়ে লাভ করতে হবে। এসব ব্যয় বাদে লাভজনক অবস্থানে যাওয়া কঠিন বলে তারা অবৈধ পথে কম দামে (সর্ব নিম্ন ১.৫ সেন্ট প্রতি মিনিট) কল আনছে যা বিটিআরসির পক্ষে তা মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে প্রতিদিন ৫৫ মিলিয়ন মিনিট আন্তর্জাতিক কল দেশে প্রবেশ করে যার মধ্যে ৩৬% কল অবৈধ পথে প্রবেশ করে থাকে। এসব কোম্পানির অবৈধ কলের কারণে বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক কলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় ২০১০ সালে বিটিসিএলের ইনকামিং কল ছিল প্রায় ৩৫৭ কোটি মিনিট যা ২০১৩ সালে এসে কমে গিয়ে দাড়ায় প্রায় ২০৯ কোটি মিনিটে। ফলে বিটিসিএলের আয় কমে যাচ্ছে।

বাজারে শেয়ার ছাড়ার চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএল কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার প্রায় ৬ বছর পার হলেও বাজরে এর শেয়ার ছাড়ার উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। শেয়ার ছাড়ার যেসব শর্ত যেমন অডিট এবং ব্যালেন্স শীটে কমপক্ষে ৩ বছর লাভজনক অবস্থানে থাকা, কোম্পানির নিজস্ব জনবল থাকা ইত্যাদির কোনোটিই বিটিসিএলের নেই। এমতাবস্থায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে বাজারে শেয়ার ছাড়লেও তা বিনিয়োগকারীদের নিকট আকর্ষণীয় না হতে পারে। অন্যদিকে বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিহার কারণেও বাজারে শেয়ার ছাড়া যাচ্ছে না। ফলে বিটিসিএলে মূলধনও বৃদ্ধি পাচ্ছে না পরিচালনা পর্ষদেও কোনো পরিবর্তন আসছে না।

বিরাজমান অন্যান্য চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প অনুমোদনে বিটিটিবির সময়ের তুলনায় সময় কম লাগলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্বের মতোই পিপিআর অনুসরণ করায় বেশির ভাগ প্রকল্পেরই সময়মত কার্যক্রম শুরু ও শেষ হয় না। ফলে সময় উপযোগী সেবা না দিতে পারায় গ্রাহক সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এতে রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিটিসিএল। আবার মোবাইল সেবা দানের জন্য বিটিটিবি টেলিটক প্রকল্প এবং টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের সাথে যোগসূত্র করার জন্য সাবমেরিন কেবল প্রকল্পটিও সম্পন্ন করে। কিন্তু এই দুটি প্রকল্পকে আলাদা কোম্পানি করায় এর থেকে যে আয় হচ্ছে তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিটিসিএল। অথচ এর ঋণের বোঝা বহন করতে হচ্ছে বিটিসিএলকেই। অন্যদিকে লাভজনক না হওয়া সত্ত্বেও ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশ হিসেবে গ্রামে-গঞ্জে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিটিসিএলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ও এক্সচেঞ্জ বসানোর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে পার্বত্য এলাকায় ১৯টি এক্সচেঞ্জের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে এক্সচেঞ্জ প্রতি মাত্র ২-৪টি সংযোগ রয়েছে।

গ্রাহক সেবা প্রদানে সীমাবদ্ধতা

বিটিসিএল ব্যয়বহুল কপার ক্যাবলের মাধ্যমে টেলিফোন সেবা প্রদান করায় প্রায়ই কেবল চুরির কারণে গ্রাহকদের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে এক্সচেঞ্জের সংযোগ দেয়ার সক্ষমতা থাকলেও ক্যাবল সংকটের কারণে গ্রাহকদের সংযোগ পেতে দেরি হয়। এক্সচেঞ্জ থেকে যে সকল গ্রাহকের অবস্থান অনেক দূরে তাদের নিজেদের ক্যাবল কিনে দিতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময় রাস্তা কাটার কারণেও কেবল কাটা পরায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং বিচ্ছিন্ন লাইনের সংযোগ পেতেও দীর্ঘ সময় লাগে। আবার পুরোনো প্রযুক্তি হওয়ায় কোনো কোনো এক্সচেঞ্জ ব্যয় অনেক বেশি কিন্তু সে পরিমাণ আয় এক্সচেঞ্জগুলো থেকে আসে না এবং এর মাধ্যমে ভ্যালু এ্যাডেট সার্ভিস যেমন শর্ট মেসেজ পাঠানো ইত্যাদি সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও বিলিং পদ্ধতি অটোমেটেড ও প্রিপেইড না হওয়া, ওয়ারলেস লোকাল লুপের মাধ্যমে সেবা প্রদান না করায় ডাটা ও ভয়েসসহ অনেক সেবা একই সাথে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বিটিসিএলের অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র

আন্তর্জাতিক শাখার দুর্নীতি -বাংলাদেশে থেকে বিদেশী কোম্পানি সেজে রাজস্ব ফাঁকি

বিটিসিএলের পলিসি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কল আদান-প্রদানের জন্য বিদেশী ক্যারিয়ারগুলোর কাছ থেকে জামানত হিসেবে ইউএস ডলারে মূল্য পরিশোধের ব্যাংক গ্যারান্টি নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ব্যক্তি, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক শাখার অসাধু কিছু কর্মকর্তার যোগসাজসে কিছু ব্যবসায়ী বিদেশী কোম্পানি সেজে বাংলাদেশে বসে এই ব্যবসা পরিচালনা করে। তারা ইউএস ডলারে ব্যাংক গ্যারান্টি না দিয়ে স্থানীয় মুদ্রায় ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়। এসব কোম্পানি কিছু দিন ব্যবসা করে ব্যাংক গ্যারান্টির তুলনায় অনেক বেশি অংকের বিল জমা করে পরিশোধ না করে অফিস ফেলে চলে যায়। একই কোম্পানি নতুন নামে একই কাজের জন্য পুনরায় বিটিসিএলের নিকট থেকে কল অদান প্রদানের অনুমতি গ্রহণ করে। বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক শাখা বিষয়গুলো জানা সত্ত্বেও অবৈধ অর্থ গ্রহণ করে পূনরায় তাদের কাজ দেয়। আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের কাছে বিটিসিএলে বর্তমানে পাওনা রয়েছে প্রায় ৯৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে যা প্রায় আদায়যোগ্য নয়।

আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের দুর্নীতি -আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আত্মসাৎ

বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে কারিগরি ত্রুটির অভিযোগ দেখিয়ে ফোন কলের রেকর্ড টেম্পারিং করা হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। এই সময়ে বিটিসিএলের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দিনে কত মিনিট বৈদেশিক কল আদান প্রদান হয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। কারণ হিসাব পাওয়ার যন্ত্র মহাখালী আইটিএক্স এর সিডিআর (কল ডিটেইল্ড রিপোর্ট) পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় ২ বছর ধরে সিডিআর নষ্ট বলে অভিযোগ তোলা হয়। প্রতিদিন গড়ে আন্তর্জাতিক কলের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫০ লাখ মিনিটেরও বেশি সেখানে কল মুছে দেওয়ার কারণে কল কমে দাড়িয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ মিনিট। মূখ্য তথ্যদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কল রেকর্ড টেম্পারিং এবং অন্যান্য আইসিএক্স ও মোবাইল কোম্পানিগুলোর পাওনা বাবদ বিটিসিএল প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব ও ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছে। কল টেম্পারিংয়ের জন্য দুদক বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ৭০০ কোটি টাকা আত্মসাতের ৪টি মামলা দায়ের করে।

অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা

অবৈধ ভিওআইপি বন্ধ করার জন্য সরকার অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিলেও বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নির্বিঘ্নে এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে। বিটিসিএলে ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন (ডিপিআই) স্থাপনের মাধ্যমেই এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব হলেও বিটিসিএল তা করেনি। টিডিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যান্ডউইথ সেবা প্রদানের কারণে বিটিসিএলের ব্যান্ডউইথের সঠিক পরিমাণ বলা সম্ভব নয়। ফলে অবৈধ পথে কতখানি ব্যান্ডউইথ ব্যবহৃত হচ্ছে তা ধরা কঠিন। এভাবে বিটিসিএলের গেটওয়ে এবং অবকাঠামো অবৈধ পথে ব্যবহার করে অবৈধ ভিওআইপি করার সুযোগ দেওয়ায় অসাধু কর্মকর্তারা আর্থিক ভাবে লাভবান হলেও বিটিসিএল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ভিওআইপি একটি প্রযুক্তি এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ব্যবসা পরিচালনা করায় বিটিআরসির মনিটরিং প্রযুক্তিকে পাশ কাটিয়ে *'টানেলিং'* করে অবৈধভাবে কল টার্মিনেশন করায় বিটিআরসির 'সিম ডিটেকশন বক্সে' অবৈধ কলের হিসাব জমা পড়ছে না। বর্তমানে অবৈধ ভিওআইপির জন্য বিটিসিএল ছাড়া আরো ৩৮টি আইআইজি কোম্পানির গেটওয়ে ব্যবহার হচ্ছে যার হিসাব বিটিআরসি রাখতে পারছে না।

অবৈধভাবে কোম্পানির ভূমি দখল

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিটিসিএল এর ভূমির পরিমান দ্বিতীয়। সারাদেশে বিটিসিএল'র ভূমি রয়েছে ১৮৪৩.২৯ একর। শুধু ঢাকাতেই রয়েছে ১৯৬.১৯ একর জমি। বিটিসিএলের এই ভূমি অনেক জায়গায়ই দখল হয়ে যাচ্ছে। কর্মকর্তাদের সহায়তায় কোম্পানির ভূমিগুলো এনওসি (No Objection Certificate) ও লীজ নিয়ে অবৈধ দখলদাররা দখল করে নিচ্ছে। এর মধ্যে কড়াইল, মতিঝিল, কক্সবাজারের কলাতলী, খুলনা ও কুমিল্লার লাকসামের জমি উল্লেখযোগ্য।

প্রশিক্ষণ এবং বদলি ও দায়িত্ব (দেখাশুনা) প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি

বিটিসিএল কোম্পানি হিসেবে এর প্রশিক্ষণ ও বদলির কোনো নীতিমালা নাই। বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা দলীয় প্রেসার খাটিয়ে এবং লবিং করে নির্বাচিত হয়ে থাকে। কাজের সাথে সম্পর্কহীন বিষয়ে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। যেমন যিনি কেবল নিয়ে কাজ

করছেন তাকে পাঠানো হচ্ছে সুইচিং বিষয়ের উপরের প্রশিক্ষণে। আবার চাকরির মেয়াদ খুব অল্প সময় পূর্বেও বিদেশে প্রশিক্ষণে পেরণ করা হয়।। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান তারা বিটিসিএলে কাজে লাগাতে পারে না।

অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ সম্পন্ন পদে পদায়নের ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত লবিংয়ের মাধ্যমে পদায়ন নিয়ে থাকে। সদস্য ও পরিচালক - মেরামত ও সংরক্ষণ, বিভাগীয় প্রকৌশলী- আন্তর্জাতিক, বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী ও উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী-ফোনস্ বহি, পরিচালক - ইন্টারন্যাশনাল, বিভাগীয় প্রকৌশলী - ইন্টারনেট (ব্যান্ড উইথ বন্টন) এবং পরিচালক- প্রশাসন, বিভাগীয় প্রকৌশলী -বিল্ডিং এবং প্রকল্পের পদগুলোতে অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় এসব পদে সকলে পদায়ন পেতে চায় । অন্যদিকে ২৫তম বিসিএস এর পরে বিটিসিএলে ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ বন্ধ থাকায় সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলীর অনেক পদ খালি রয়েছে। দুই তিন ধাপ উপরের এসব পদে অনেক উপ সহকারী প্রকৌশলী, মেকানিক ও টেকনিশিয়ানদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেখাশুনা করতে দেওয়া হয়েছে। এই পদগুলোর মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় হওয়ায় অর্থ আত্মসাতের সুযোগও এখানে বেশি। আর এসব পদে নিম্ন পদস্থ কর্মচারীরা কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পদায়ন নিয়ে থাকে।

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের অনিয়ম-দুর্নীতি

এ খাতে বাৎসরিক বাজেটের অর্থ বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের খরচ ছাড়াও সিবিএ নেতা ও মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে অবৈধভাবে প্রদান করতে হয়। ১ কোটি টাকা বাজেট হলে সিবিএকে দিতে হয় প্রায় ৭ লাখ টাকা এবং টাকার হিসাব ডিইকে মাসিক খরচের বিভিন্ন ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে বা অন্য কোনোভাবে মেলাতে হয়। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাও অবৈধভাবে কিছু টাকা আত্মসাৎ করে। মূখ্য তথ্যদাতার মতে, 'বরাদ্ধকৃত টাকার সর্বোচ্চ ৬০% সংশ্লিষ্ট খাতের কাজে ব্যয় হয় আর বাকিটা অবৈধ খরচ হয়'। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রয়কৃত জিনিসের দাম বাজার দরের চেয়ে বেশি দেখানো হয়। যেমন ৮০০ টাকার কার্টিজ ৪০০০ টাকায় কেনার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।

পরিবহন খাতে দুর্নীতি

বিটিসিএলের গাড়ি মন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারাও ব্যবহার করে, যার ব্যয় দেখানো হয় বিটিসিএলে। প্রকল্পের গাড়ির ক্ষেত্রে নথিপত্রে গাড়ি ভাড়া ও জ্বালানী ব্যয় দেখিয়ে রেন্ট এ কারের যোগসাজসে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। এক্ষেত্রে গাড়ি প্রতি মাসিক ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এসব গাড়ি কখনই প্রকল্পে আনা হয় না। অন্যদিকে বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিসগুলোতে গাড়ির ড্রাইভারদের মাসিক ১৬০ ঘন্টা থেকে ১৮০ ঘন্টা পর্যন্ত ওভারটাইম, এক মাস পর পর গাড়ি প্রতি ১৫ হাজার টাকা মেরামত ব্যয় এবং সিএনজি চালিত গাড়িগুলোতে প্রতিমাসে ৩০ লিটার তেল অতিরিক্ত প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। গাড়ি মেরামত ও জ্বালানী বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকায় পরিবহন শাখার লোকজন এই অর্থ প্রয়োজন না হলেও ভূয়া ভাউচার বানিয়ে ব্যয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করে। এ ধরনের বিলে কর্মকর্তারা স্বাক্ষর করতে না চাইলে গাড়ি বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়।

সিবিএর হস্তক্ষেপ এবং অনৈতিক কার্যক্রম

বিটিসিএলে সিবিএর দৌরাত্ম এত বেশি যে, তারা যেকোনো দাবিতে কর্মকর্তাদের কার্যালয় ঘেরাও, দাবি মানতে নানা রকম হুমকি, টেবিল চাপরানো, মারধরসহ বিভিন্ন অশোভন আচরণ করে থাকে। তাদের সামনে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মকর্তাগণ অসহায়। কন্ট্রাকটরদের ফাইল খুলে দেখা এবং তাদেরকে সিবিএ তহবিলে টাকা দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ, কোম্পানির খালি জায়গায় ঘর তুলে ভাড়া দেয়া, বাসা বরাদ্ধের জন্য চাঁদা আদায়, বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসের সিবিএ ইউনিটকে মাসিক ৩-৫ হাজার টাকা প্রদানে বাধ্য করা, সিবিএর অবৈধ কাজের জন্য প্রতিবাদ করলে মন্ত্রণালয়কে বলে বদলি করানোর মত দুর্নীতির সাথে সিবিএর লোকজন জড়িত।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি

সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলীদের জন্য যে বাসা বরাদ্দ রয়েছে সে বাসাগুলোতে পরিচালক, বিভাগীয় প্রকৌশলী ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণ দখল করে আছে। এই বাসাগুলোর ভাড়া মাত্র ৩০০ টাকা হওয়ায় এসব কর্মকর্তাগণ তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাসায় বেশি ভাড়া দিয়ে থাকতে চায় না। অথচ তারা বিটিসিএল থেকে তাদের পদমর্যাদা অনুসারেই বাসা ভাড়া গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে প্রাইভেট মোবাইল, আইজিডব্লিউ, আইআইজি কোম্পানিগুলো বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে অবৈধভাবে বিটিসিএলের অবকাঠামো ও

যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। অবৈধভাবে সুবিধা প্রদান করার জন্য বিটিসিএলের খুলনা, সিলেট এবং পাবনা কার্যালয়ের তিনজন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। আবার বিটিসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিযোগাযোগ কোম্পানিতে কর্মরত থেকে বিটিসিএলের সুবিধা বেসরকারি কোম্পানিকে পাইয়ে দিচ্ছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘ দিন ধরে কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল ঘোষণা হলেও সঠিক, কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন না হওয়ায় বিটিসিএল কোম্পানির মত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। আবার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় নতুন অর্গানোগ্রাম অকার্যকর এবং প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব দেখা দেয়। টেলিযোগাযোগ নীতিমালা রাজনৈতিক নেতা ও প্রাইভেট কোম্পানির স্বার্থে অপপ্রয়োগের ফলে বিটিসিএলের রাজস্বের উপরে এর নেতিবাচক প্রভাব পরছে। মন্ত্রণালয়-নির্ভর পরিচালনা বোর্ড হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ এবং সরকারি নিয়ম অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনার ফলে যুগোপযোগী প্রযুক্তির সেবা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে বিটিসিএল। উপরের জটিলতা এবং অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান থাকায় গ্রাহক হয়রানি করা ও রাজস্ব হারিয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বিটিসিএল।

সুপারিশঃ

আগামী ৬ মাসের মধ্যে বিটিসিএলকে সম্পূর্ণ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সুপারিশটি কার্যকর করা ও উপরের সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য টিআইবি বিটিসিএলের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের জন্য আরো কিছু সুপারিশ প্রদান করছে।

১. পরিচালনা বোর্ডে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কমাতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করতে হবে এবং পরিচালনা বোর্ড টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা ও প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে;
২. বিটিসিএল, টেলিটক এবং বিএসসিসিএল (সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লি.) -এই তিনটি কোম্পানিকে একত্রীভূত করে একটি কোম্পানিতে রূপান্তর করতে হবে;
৩. যত দ্রুত সম্ভব বাজারে শেয়ার ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে;
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে;
৫. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা ও পদায়নের জটিলতা দূর করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
৬. নিয়োগের নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করে দ্রুত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোকবল নিয়োগ করতে হবে;
৭. বিটিসিএলের নিজস্ব ক্রয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;
৮. আইজিডব্লিউ অপারেটরদেরকে অভিন্ন প্লাটফরমের নিয়ন্ত্রণে ব্যবসা পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৯. সরকার পরিচালনায় অপরিহার্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বিটিসিএলের একটি আলাদা ইউনিট গঠন করতে হবে যার কার্যক্রম মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে না হয়ে, সেবামূলক উদ্দেশ্যে হবে;
১০. রাজস্ব বৃদ্ধির বাস্তবমুখী টার্গেট গ্রহণ করে সে সম্পর্কে কোম্পানির প্রতিটি স্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনা তৈরি করতে হবে;
১১. ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে;
১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি 'গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
১৩. বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রতি বছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে;
১৪. নিরীক্ষার পরে চিহ্নিত অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
১৫. গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাপক প্রচরণা ও কাস্টমার সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।